তুষার রায়

সেল্ফ অ্যাসেস্‌মেন্ট

গতকাল খুব রাত করে বাসায় ফিরেছে নিরুপম। শনিবার রাতে একটু আয়েশ করে বেখেয়ালে সময় কাটানো যায়। এমনিতেই আড্ডাপ্রিয়, তার ওপর পুরনো বন্ধু-বান্ধব কয়েকজন জুটে গেলে তো কথাই নেই।

মাঝরাতে বাড়ি ফিরে পারিবারিক শান্তিতে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে নিঃশব্দে পড়ার ঘরের ছোট্ট বিছানাতে ঘুমাতে চেষ্টা করছিল। এই এক দোষ নিরুপমের। শোবার জায়গা পাল্টালে কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। মাথাটাও কেমন ঝিমঝিম করছে। হবে না? বহুদিন পর স্কচ পান করেছে যৌবনের উদ্যম নিয়ে, কিন্তু সে নবীন বয়সটা তো আর নেই! এরওপর ঠাট্টা-চুট্‌কির সাথে দমফাটা হাসি। গলা ও মাথা দুটোতেই ভীষণ চাপ পড়েছে। কিন্তু ঘুমোতে যে হবেই। কাল উইকএন্ডের শেষ দিন, রাজ্যের কাজ জমে আছে!

এরকম আসর হলে সজল ও মল্লিকা পুরোদস্তুর পানাহারের ব্যবস্থা করে। বন্ধুদের মধ্যে এ জুটিটিই উল্লেখযোগ্য। ইউনিভার্সিটিতে সাড়াজাগানো সুন্দরী মল্লিকাকে নিয়ে কত প্রতিযোগিতা। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে সজল জিতেছিল। সবাই বলত, মল্লিকা শুকনো মন ছেড়ে সজল-ভালোবাসার সন্ধান পেয়েছে। রথিনটা জমাতেও পারে। কোত্থেকে যে এত সরস গল্প যোগাড় করে! মোক্ষম সময়ে রসিয়ে ডেলিভারি দেয়। ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হিসেবে গুরুগম্ভীর ভাব করে থাকে সারাদিন। তাই হয়ত আড্ডাতে এসে ওটা ব্যালান্স করে নেয়।

উত্তম আর সেলিমের কথা মনে পড়ছে খুব করে। আশ্চর্য, ছ'ঘন্টার মধ্যে মাত্র একবার উঠেছিল ওদের প্রসংগ। অথচ, ওদের কথাই বেশি করে মনে পড়ছে এই মূহুর্তে। কলেজ জীবনের এই পাঁচ জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মধ্যে ছিটকে পড়েছে ওরা দু'জন। উচ্চ মাধ্যমিকের বেশি এগুতে পারেনি উত্তম। অনেক দেন-দরবার করে প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারী জুটিয়েছিল। কিন্তু অভাবের সংসারে ওই বেতন খরার সময় দু'ফোটা বৃষ্টির মতই শুকিয়ে যায়। পরিবারে ও সমাজে এখন সে একজন অধম পুরুষ হিসেবে বিবেচিত। সেলিম কী জানি কি ব্যবসা করে অনেক টাকা বানিয়েছে। যা' অস্থিরচিত্ত ওর, ঐ টাকা কতদিন থাকে কে জানে!

সকালবেলা বাজার-ফিরতি দেখা হয়ে গেল পূর্বপাড়ার শংকরের সাথে। ওর সাথে নিরুপমের তেমন একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। এ-পাড়া ও-পাড়া ফুটবল ম্যাচ হলেই শুধুমাত্র কথা হতো ওদের মধ্যে, দুই দলের অধিনায়ক হিসেবে। তিন ভাই দু'বোনের মধ্যে ও-ই সবার বড়। অল্প কিছু জমি-জিরেত যা' ছিল, অসুস্থ বাবার চিকিৎসা ও বোনদের বিয়েতেই তা' শেষ। ফলে লেখাপড়ার সাথে সম্পর্ক হাইস্কুলেই চুকে যায়। উপজেলা অফিসে সামান্য কেরানির কাজ করে। এখন ওর স্বাস্থ্যই বলে দেয় সংসারের কী দৈন্যদশা।

খেলার সময় শংকরের কাছ থেকে বল কেড়ে নেয়া ছিল প্রায় অসম্ভব। তেলকুচ্‌কুচে পেটানো শরীর, সুযোগমত বল পেলেই সোজা গোলে ঢুকিয়ে দিত। বলল, 'এসো না একটু বেড়াতে, আমরা কত বলি তোমাদের কথা। না হয় যত্ন-আত্তির তেমন করতে পারবো না, তবুও এসো, সবাই খুব খুশি হবে।'

বাড়িতে ফিরতেই অবাক হয়ে যায় নিরুপম। স্ত্রী শোভা বলল, 'মাস্টারমশাই এসেছেন সকাল বেলা'।

: কোন্ মাস্টারমশাই?

কপালে চোখ তুলে শোভা বলল, 'তোমাদের মাস্টারমশাই, আবার কে? তোমাদের ছেলেবেলার সেই মাস্টারমশাই তারাপদবাবু, যার কথা তোমার কাছে সবসময় শুনি। দেখি, কী বাজার এনেছ? কিছু লাগলে আমি হারান খুড়োকে দিয়ে আনিয়ে নেব। তুমি বৈঠকখানায় যাও, তোমার বন্ধুরাও এসেছে।'
মাস্টারমশাইয়ের কথা শুনে ভয়, উত্তেজনা ও আনন্দের এক মিশ্র অনুভূতি হল নিরুপমের।
তাইতো, এতদিন মাস্টারমশাইয়ের কথা একবারও ভাবা হয়নি। যেমন পাংচুয়াল, তেমনি নীতিবান মানুষ উনি। ওদের বাড়ির গৃহশিক্ষক হিসেবে ছিলেন অনেক বছর। শিক্ষকতা করতেন ওদেরই এলাকার হাই স্কুলে।
হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছে ওঁর কাছে। নিজেরা কাকাতো-জ্যাঠাতো ছয় ভাইবোনসহ পড়শী অনেক ছেলেমেয়েও আসত পড়তে। মূলতঃ বাংলা ও ইংরেজী পড়ালেও শিক্ষকের অভাবে ইতিহাস, ভূগোল, কৃষিবিজ্ঞান, ধর্ম এমনকি অংকের ক্লাসও তাঁকে নিতে হতো। পড়াতেনও চমৎকার। বলতেন, 'বাংলাভাষাভাষী কেউ যদি ভালো ইংরেজী শিখতে চাও, তবে বাংলাটা আগে ভালো করে শেখো। এই দুই ভাষা আমাদের কাছে দুটি চোখের মত, একটাকে বাদ দিলে অন্যটা দুর্বল হয়ে পড়ে।'
সত্যি কথা বলতে ওঁরই উপদেশ ও অনুপ্রেরণা নিরুপমের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।
প্রধান শিক্ষকের পদ নেয়ার জন্য বহুবার স্কুল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছে। তিনি নেননি। বলেছেন, 'ওটা শিক্ষকতা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়'। শিক্ষকদের অধ্যয়নের ব্যাপারেও তিনি দৃঢ় অভিমত পোষণ করতেন। তাঁর মতে, 'শিক্ষা দান করতে হলে শিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়াও অব্যাহত রাখতে হবে।'
ছাপ্পান্ন সালে বি,এ পাশ করে এই স্কুলে যোগদান করেন। তারপর একটানা তিরিশ বছর শিক্ষকতা। শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে পুরষ্কৃত হয়েছেন। উপজেলা হবার পর পাল্টে গেল সব। নতুন কারিকুলামের সাথে সাথে এল উচ্চডিগ্রিধারী তরুণ শিক্ষকের দল। বিদায় নিল পুরনো ও বৃদ্ধরা। তাঁরই এক ছাত্র এখন ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁকে রাখতে চেয়েছিল। তিনি থাকেন নি। স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ করেছেন। বেসরকারী স্কুল হিসেবে এককালীন টাকাও তেমন পাননি। সংসার কী করে চলে কে জানে!
এসব নিরুপম শুনেছে তার বাবার কাছে।
অপুত্রক মাস্টারমশাইয়ের তিন মেয়ে। প্রথম দু'জনের বিয়েতে জমিজমাটুকু বন্ধক পড়েছিল। শোধ দিতে না পারায় হাতছাড়া হয়েছে। শেষের মেয়ে সবিতা। এক ক্লাস নীচে পড়ত ওর। অনুরাগের একটা সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল ওদের মধ্যে। গ্রামের বাড়িতে থাকলে হয়ত সেটা আরো গভীর হতো। সবকিছুর মধ্যে এই কথাটি নিরুপম এখনো বলেনি শোভাকে। কিছু কিছু স্মৃতি বুকের মধ্যে আড়াল করে রাখতে হয় মুক্তোর মত, নইলে ওগুলোর অমর্যাদা হয়।
একবার দোল উৎসবের সময় আবীর দেয়ার ছলে আড়ালে ওর হাত ধরে নিরুপম বলেছিল, 'জানো, কচ খুব স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর, দেবযানীকে কীভাবে উপেক্ষা করে চলে গিয়েছিল।' সবিতার মুখে গোধূলির লাল আভা এসে পড়েছিল। আঙুলে শাড়ীর আঁচল জড়াতে জড়াতে আনত মুখে বলেছিল, 'বিশ্বকবির দেবযানী ব্যতিক্রম, সাধারণ দেবযানীরা বাক্যহীনা।' দৃষ্টি ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ হঠাৎ আনমনা হলো সে, একপ্রকার স্বগতোক্তির মতো বললো, 'বিদায় বেলায় অমন করে মুখ ফুটে তারা বলতে পারে না।'
অনেক পরে শুনেছিল, সবিতার বিয়েতে একজোড়া দুধের গাভীসহ মাস্টারমশাইয়ের সোনার মেডেল ও তাঁর স্ত্রীর গয়না-পত্র সবই বিক্রী করতে হয়েছিল। তবুও কারো কাছে হাত পাতেননি তিনি। অথচ শোভার শাড়ী গয়নার নতুন নতুন সংস্করণ কিনতে কত টাকাই না অযথা খরচ করে তারা। একটা অপরাধবোধ তাকে আড়ষ্ট করে ফেলে। অন্ধকারে হাতড়ে চশমা খোঁজার মতো করে একটা যুক্তি বের করলো সে। এযুগে দু'জনের আয় ছাড়া কী স্বচ্ছন্দে সংসার চলে? ভালোই করেছে সে শোভার মত উচ্চশিক্ষিতা যুগোপযোগী মেয়েকে বিয়ে করে। নিজেকে সান্ত্বনা দিল নিরুপম।

দক্ষিণের ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে ডানে বৈঠকখানা। ওদিকে যেতেই দৌড়ে আসে নিরুপমের নয় বছরের মেয়ে তুলি। 'ও বাবা জানো মাস্টারমশাই এসেছে, আমাকে একখানা বই দিয়েছে, দিপুকেও একখানা। দেখবে এসো, মাস্টারমশাই কত্তো গল্প বলছে।'

বৈঠকখানার বারান্দায় পা দিতেই সবাই ওর দিকে ফিরে তাকায়। রথীন, সজল, সেলিম, উত্তম সবাই হাজির। দু'পাশের চৌকিতে সবাই বসে। মাঝখানের পুরনো কাঠের চেয়ারে বসে মাস্টারমশাই হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছেন। বারান্দায় জলচৌকিতে বসে সাত বছরের ছেলে দিপু একখানা পুরনো বই উল্টে-পাল্টে দেখছে।

ওদের সবার পরিপাটি পোশাক-পরিচ্ছদ এই গোলপাতার ঘরে বড্ড বেমানান লাগছে। সোজা গিয়ে প্রণাম করে নিরুপম। বলে, 'আমি কালই হয়ত যেতাম, আপনার কথা বাবা চিঠিতে লিখেছিলেন।' সাদা চুল ও দাঁড়িতে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের ঋষিতুল্য চেহারা এনে দিয়েছে। সস্নেহে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন তিনি। বলেন, 'তোমাদের সবাইকে একসাথে দেখতে পারা যে আমার পক্ষে কত বড় আনন্দের ব্যাপার সেটা আমি ছাড়া আর কে বুঝবে?'

রথীন বলল, 'আমরা সবাই আজ মাস্টারমশাইয়ের সাথে চড়ুইভাতি করব তোদের পুকুরপাড়ে। পূবপাড়া থেকে মিজান, মাধব আর সুনীলকেও আসতে বলেছি। আচ্ছা আমি একটু দেখি, ওদিকে আয়োজনের কতদূর কী হলো।' বলেই ভেতরবাড়ির দিকে বেরিয়ে গেল রথীন।

পাশে টেবিলে রাখা হামানদিস্তায় বাটা পান-সুপারি মুখে দিয়ে ঘন ঘন চিবোচ্ছেন মাস্টারমশাই। সবার দিকে একবার তাকিয়ে নিরুপমের মুখে চোখ স্থির করলেন তিনি। 'দেখো, আমি এখন ঠিকমত দেখতে-শুনতে পাই না। তবে তোমাদের আসার খবর পেয়ে কষ্ট করে এসেছি শুধু একটা শেষ পরীক্ষা নেবার জন্য। এটা আমার জন্যও পরীক্ষা বটে! সারাজীবন তো শিক্ষকতাই করলাম। তবে তার ফল কোথায় কতটুকু ফলল সেটা একটু যাচাই করে দেখতে চাই।'

সবাই একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। মাস্টারমশাই বলে চললেন, 'তোমাদেরকে সবসময় বলতাম, ভাল রেজাল্ট করাটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার চেয়েও জরুরি হলো পূর্ণাঙ্গরূপে মানুষ হওয়া। এজন্য প্রতিনিয়ত আত্মোন্নয়নের চেষ্টা করতে হবে। কারণ, প্রকৃত অর্থে মানুষ না হলে অন্য সবের কোনো অর্থই নেই।'

আশ্চর্য, আজ পঁচিশ বছর পর এ কী হচ্ছে! সবাই আজ স্ব স্ব পেশায় সুপ্রতিষ্ঠ। বয়সও সবার চল্লিশের কোঠায়। মাস্টারমশাইয়ের মাথা-টাথা কী খারাপ হয়ে গেল? যেতেই পারে! বয়স কী কম হলো? কথায় বলে, একটানা বারো বছর মাস্টারী করলে নাকি পৃথিবীর সবাইকে ছাত্র বলে মনে হয়!

'শোনো, প্রশ্নগুলো আমি তিরিশ বছর আগেই ঠিক করে রেখেছি।' বলে একটু নড়ে-চড়ে বসলেন। 'মাত্র পাঁচটি প্রশ্ন। উত্তরগুলো অবশ্য তোমরা সবাই জানো।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। নিজেকে যেন একটু গুছিয়ে নিলেন মাস্টারমশাই। 'যদি তোমরা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও, শুধুমাত্র তবেই আমি আজ এখানে তোমাদের সাথে খাবো। নইলে আবার এই বোশেখের রোদে আড়াই মাইল রাস্তা হেঁটে বাড়ি যেতে হবে।'

অস্বস্তি ও আশংকায় সবাই ঘামতে থাকে। সজল আর সেলিম জল গড়িয়ে খেল। বারান্দার এককোণে বসে তুলি দুলে দুলে পড়ছে, 'এক চন্দ্র, দুই পক্ষ, তিন নেত্র, চারি বেদ, পঞ্চ বান, ছয় ঋতু, সাত সমুদ্র, অষ্ট বসু, নয় নবগ্রহ, দশের দিক, এক দশ এক এগারো ...।' গণনা শেখার সাথে বাড়তি জ্ঞানার্জনের এই চমৎকার পদ্ধতি তো কারো মুখে এখন শোনাই যায় না।

: 'বাবা, পঞ্চ বান আর অষ্ট বসুর মানে কী?'

উত্তরহীন নিরুপম তাকিয়ে থাকে মেয়ের দিকে। সবাই নীরব। বৈঠকখানার পেছনে শিরীষ গাছটায় কাঠঠোক্রার খট্টর-র-র খট্টর-র-র আওয়াজ ক্রমশঃ তীব্র হয়ে বাজতে থাকে।

: 'তাহলে শুরু করা যাক্, কী বলো?' মাস্টারমশাইয়ের প্রশ্নে সম্বিৎ ফিরে পায় নিরুপম।
: 'প্রথম প্রশ্ন, নিজ নিজ পেশায় সততা বজায় রেখেছ কে কে?' একটু নড়েচড়ে বসে সেলিম, কপালে দুশ্চিতার কয়েকটি ভাঁজ স্পষ্ট হয়। রুমাল দিয়ে বারবার ঘাম মোছার চেষ্টা করে।
: 'ব্যক্তিগত জীবনে আদর্শ অনুসরণ করেছ কতটুকু? পরিবারের ও প্রতিবেশিদের প্রতি তোমার কর্তব্য কতটুকু পালন করেছ? দেশের জন্য কে কী করেছ?'
এটুকু বলে একটু থামলেন মাস্টারমশাই। দৃষ্টি প্রসারিত করেন দূরে। বৈঠকখানার সামনের আঙিনা ছেড়ে দূরে উন্মুক্ত প্রান্তরে। গ্রীষ্মের এ তপ্ত দুপুরে কোনো জনমানবের চলাচল দেখা যায় না, শুধু মাঝে মাঝে আকাশে চিলের ডাক শোনা যাচ্ছে। মাস্টারমশাইয়ের দৃষ্টিও তাই স্থির। যেন স্থাণুর মত মিশে গেছেন চেয়ারের সাথে। মনে হয় চিন্তার ধূসর পথ বেয়ে চলে গেছেন বিগত শতাব্দীতে। শুধু অসংলগ্ন চিন্তার কিছু স্খলিত অংশ বেরিয়ে আসছে তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বেয়ে।
বাইরে যাবার কথা বলে সেলিম চলে গেল। ওরকমই একটা ছুঁতোয় তাকে অনুসরণ করল উত্তম ও সজল।
: 'শেষ প্রশ্ন।'
নিরুপম ফিরে তাকায় মাস্টারমশাইয়ের দিকে। স্বগতোক্তির মত বলে যান মাস্টারমশাই।
: 'অন্ততঃ একজন দরিদ্র অনাথের দায়িত্ব নেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তোমরা সবাই। বর্তমানে তোমাদের প্রত্যেকেরই এর চেয়ে ঢের বেশি সঙ্গতি আছে। কে কয়জনের দায়িত্ব নিয়েছ? নিদেনপক্ষে বৃদ্ধ অসহায় অথবা কন্যাদায়গ্রস্থ কোনো পিতামাতার সহায় হয়েছ কেউ?'
নতমুখে একা অসহায় বসে থাকে নিরুপম। সবকিছু যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। মনে হয় পুরো বৈঠকখানাটি শূন্যে উঠে দোল খাচ্ছে। শক্ত হয়ে বসে, ঠেস্ দিয়ে বসে থাকা খুঁটিটি ধরে।
উত্তম, সেলিম, সজল, রথীন, নিরুপম কেউ-ই এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারবে না। বর্তমান যুগের এই কঠিন বাস্তবতায় সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে আপোষহীনতা ও নৈতিক দৃঢ়তা সব সময় বজায় রাখা সম্ভব নয়। মাস্টারমশাই এসব কী আবোল-তাবোল বলছেন!
: 'আমি জানতাম, আমি জানতাম, তোমরা প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবে না। আমি কত গর্ব, কত আশা করে...।' বলতে বলতে বারান্দার খুঁটি ধরে নীচে নামেন। ছাতা মেলে লাঠি ভর দিয়ে শ্লথ পায়ে এগুতে থাকেন পথের দিকে।
কোমরে শাড়ী গুঁজতে গুঁজতে শোভা দৌড়ে আসে ভেতরবাড়ি থেকে।
: 'মাস্টারমশাই, মাস্টারমশাই কোথায় যাচ্ছেন, আসুন চড়ুইভাতি, মাস্টারমশাই, নিরুপম ...।'

'বাবা, ও বাবা, কী হলো, ওঠো...।'
ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে যায় নিরুপমের। তড়িঘড়ি করে উঠে দুহাতে চোখ ঘষে দৃষ্টি স্বচ্ছ করে নিরুপম। তুলি দাঁড়িয়ে আছে তার বিছারনার পাশে। লালপেড়ে শাড়ি পরেছে। কোমরে আঁচল গুঁজলেও অর্ধেকটা মেঝেতে লুটোচ্ছে। মাথায় লাল ফিতে দিয়ে চুল বাঁধা। গলায় বাহারি ফুলের মালা।
:'তুমি প্রমিজ করেছিলে, আজ একুশে ফেব্রুয়ারি, সকাল-সকাল উঠবে। এ্যাসফিল্ড পার্কের শহীদ মিনারে যাবে। তুমি প্রমিজ রাখতে পারোনি বলে আমি তোমায় জাগিয়ে দিলাম।'
কী দুঃস্বপ্নই না দেখছিল নিরুপম! মনে হলো উঁচ দালানের ছাদ থেকে পা ফস্কে পড়ার আগে কেউ তাকে পেছন থেকে ধরে ফেলেছে। এই হালকা শীতেও কপালে, গলায় বিন্দু বিন্দু ঘাম। প্রবাস জীবনের বাস্তবতায় দূরে ফেলে আসা অতীত অজান্তে হানা দিয়ে যায় বারবার।
অপলক চেয়ে থাকে তুলির দিকে। কী পবিত্র লাগছে মেয়েটিকে। কাছে ডেকে বুকে জড়িয়ে ধরে ওকে।
: 'হ্যাঁ মা, জাগিয়ে দিয়ে ভালোই করেছিস্। দেখিস্, আমি আর কক্ষনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবো না।'